আপনার সন্তানটিও হতে পারে একজন সুপার স্টার

লিখেছেন **নাভিদ আকবর**

এই মুহূর্তে আপনার শিশুটি কি করছে? খুব সম্ভবত সে বিশাল ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে একটা টেনিস বল পেটাচ্ছে। নিজেকে শচীন বা লারা ভেবে হাঁকিয়ে চলছে একের পর এক চার, ছয়। অথবা কম্পিউটারের সামনে বসে কমান্ডো টু খেলার পরিবর্তে, সেটআপে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে বাক্সটার ভেতরে আসলেই কিসের কারসাজি আছে। হারমোনিয়ামের রিড থেকে বেসুরে বেরোতে থাকা শব্দ তরঙ্গের সঙ্গে মেলাতে চাইছে সুর। অথবা সাদা কাগজে, নতুবা ডিস্টেম্পার করা দেয়ালে, রঙচঙে অর্থহীন আঁকিবুঁকি কেটে তাতে আপন মনে ছবি তৈরি করছে। আপনার সামনেই আপনার শিশু প্রতিনিয়ত এরকম অসংখ্য কার্যকলাপ ঘটিয়ে চলছে। মা-বাবা হিসেবে আপনার করণীয় কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

আপনার কখনো কি মনে হয়েছে, আইনস্টাইন বা রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীটাকে কিভাবে জয় করলো? কিভাবেই বা এলেন শচীন টেন্ডুলকার, মার্টিনা হিঙ্গিস, বিল গেটস্ বা অমর্ত্য সেন? উত্তর একটাই– প্রতিভা! এরা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রতিভাবান। নিজের মেধা খাটিয়ে সাফল্যকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। আপনার শিশুটি হতে পারে তাদের একজন। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার শিশুটি তো এই বিখ্যাত ব্যক্তিদের মতো মেধাবী নয়। ব্যাপারটি আসলেও তা নয়। আপনার শিশুটিও মেধাবী। তার মধ্যেও ও রয়েছে প্রতিভা। শুধু যেটি দরকার তা হচ্ছে তার এই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ। এই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটলে আপনার শিশুটিও পেতে পারে সাফল্য। স্মরণীয় ব্যক্তিত্বে।

'প্রতিভা' ছোট্ট একটি শব্দ অথচ কতই না রহস্যময়। আসলেই কি তাই? সাধারণ প্রায় সব মানুষের মনেই এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল যে, প্রতিভা সম্পূর্ণই ঈশ্বরপ্রদত্ত। ভাগ্যবান কিছু মানুষ ঈশ্বরের বিশেষ দান এই প্রতিভা নিয়ে কখনো কখনো পৃথিবীতে

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

এদেশের তরুণ এখন মাইক্রোসফটে কাজ করছে। মেধা দিয়েই সে এমন ঘটনাকে সম্ভব করেছে। এদের সংখ্যা হয়তো কম। তবে আছে। বিশ্বের সুপারস্টারদের তালিকায় কোনো বাংলাদেশীর নাম না থাকলেও আমরা যে মেধা নিয়ে জন্মাইনি তা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ব্লুম বিশ্বাস করেন না। ব্লুম বলেন, 'প্রতিটি শিশু মেধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই সুপারস্টার হয় যারা পরিশ্রম ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটায়।'

অনেকে বলেন, একজন আইনস্টাইন কিংবা একজন রবীন্দ্রনাথ পাবার জন্য শত বছর অপেক্ষা করতে হয়। প্রেক্ষাপট বিচার করলে কথাটা হয়তো সত্যি। কিন্তু তারপরও কথা থাকে। বলা হয়ে থাকে মেধার বিকাশের কথা। সুযোগের কথা। আগ্রহের কথা। ব্লুমের ভাষ্য অনুযায়ী, যে কোনো শিশুই হতে পারে সুপারস্টার।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মেধা বিকাশের সুযোগ থাকলেও আমাদের দেশে তা সীমিত। শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো নিয়ে যে দেশে এতো প্রচারাভিযান করতে হয়, সেখানে সঠিক পরিচর্যা মেধার বিকাশের কথা বাতুলতা মাত্র। শিশুর মেধার বিকাশের জন্য বাবা-মাকে হতে হয় সচেতন। বাবা-মা'র সচেতনতা শিশুর মেধা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিশুর জন্য নিতে হয় সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. দিলরুবা আফরোজ ২০০০কে বলেন, 'শিশুদের জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ বাবা-মাই এই যত্ন নিতে পারেন না। বাবা-মা শিক্ষিত হলে তারা বুঝতে পারে শিশুটির জন্য কোন সময়ে কোন জিনিসটি প্রয়োজন।'

এ কথাটি সত্যি শিক্ষিত বাবা-মা একটু সতর্ক হলেই তার সন্তানের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেন। পৃথিবীব্যাপী যারা বিখ্যাত হয়েছেন, তাদের জীবনী ঘাটলে দেখা যায় এরা সবাই তাদের পছন্দের বিষয়গুলোর ওপর কাজ করে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। দেখা যেত তারা পড়াশোনায় হয়ত ভালো ছিলো না কিন্তু অন্যদিকে যেমন খেলাধুলা, সাহিত্য রচনায় আগ্রহ ছিলো। নজরুল, রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যেতে পারে। স্কুল পালিয়ে বেড়ানো কৈশোর পরবর্তীতে বিখ্যাত কবি হন। তাহলে একটি বিষয় পরিষ্কার। বাবা-মা হিসেবে আপনাকে বুঝতে হবে আপনার শিশুটির আগ্রহ কোন বিষয়ের প্রতি। আপনি হয়তো আপনার ছেলেকে ডাক্তার বানাতে চান কিন্তু ছেলেটির আগ্রহ রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে ব্যর্থতার সম্ভাবনাই বেশি। ড. দিলরুবা আফরোজ বলেন, 'একটি শিশুর অনেক দিকে সম্ভাবনা থাকে। বাবা-মা'র দায়িত্ব হচ্ছে শিশুটির সম্ভাবনাকে খুঁজে বের করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। শিশুটির সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকশিত হওয়ার জন্য এমন উদ্যোগ তাকে সাহায্য করে।'

আমাদের দেশে বাবা-মা মাত্রই বোঝেন মেধাবী সন্তান মানে পড়াশোনায় ভালো। স্কুলের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারা শিশুটি বিবেচিত হয় মেধাবী হিসাবে। সন্তানের পড়ালেখা ছাড়া অন্য আগ্রহকে দেখা হয় ছোট করে। ড. দিলরুবা আফরোজ বলেন, চলে আসেন, আর তাদের অবদান স্পর্শে আমরা সাধারণ মানুষেরা ধন্য হই। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা কিন্তু বলছে অন্য কথা। প্রতিভা ঈশ্বর প্রদত্ত অবশ্যই, তবে এ কথা শুধু 'ভাগ্যবান'দের ক্ষেত্রে নয়, প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রতিটি মানুষের ভেতরে প্রতিভার বীজ লুকিয়ে আছে, সঠিক পরিচর্যার জল, হাওয়া পেলে তা ঠিকই একদিন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। আপনার শিশুটিও জয় করতে পারে তাবৎ বিশ্বকে। প্রতিভার বলে পেতে পারে উন্নততর জীবন। কিন্তু এই প্রতিভা বিকাশের জন্য চাই পরিচর্যা। একজন মা তার সাধানী সঠিক হাতে এবং সঠিক সময়ে সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সন্তানের প্রতিবার বিকাশ ঘটাতে পারে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা গবেষক বেনজামিন ব্লুম (Benjamin Bloom) একদল গবেষণা সহকারীর সহায়তায় পাঁচ বছর মেয়াদি একটি গবেষণা করেন তিনি একশ' কুড়িজনের ওপর

আলবার্ট আইনস্টাইন

বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের নাম শোনেননি এমন লোক বোধহয় পাওয়া যাবে না। বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞান চর্চায় তাঁর মতো অবদান এ পর্যন্ত আর কোনো মানুষই রেখে যেতে পারেননি। আইনস্টাইনের প্রদত্ত 'থিওরি অব রিলেটিভিটি'র ওপর ভিত্তি করেই বর্তমানে সময়, স্পেস, এনার্জি এবং অ্যাডিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার কাজ এগিয়ে চলছে। নোবেল বিজয়ী এই বিজ্ঞানী কিন্তু জন্ম নিয়েছিলেন খুব সাধারণ একটি পরিবারে। মজার ব্যাপার হলো মা পলিন আইনস্টাইন এবং বাবা হারম্যান আইনস্টাইন কারোরই বিজ্ঞান কিংবা অংকশাস্ত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিলো না। এমনকি শিশু আইনস্টাইনও ছিলেন অত্যন্ত সাধাসিধে এবং পড়াশোনার ব্যাপারে চরম আগ্রহহীন। এলিমেন্টারি স্কুলে পড়বার সময় অংক এবং বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোতে তার প্রায় কোনো ধরনের দখলই ছিলো না। লেখা পড়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরকম ব্যর্থতা আইনস্টাইনের অভিভাবকদের ভাবিয়ে তুলেছিল তাঁদের ছেলের মানসিক সুস্থতা নিয়ে। পরবর্তীতে দেখা গেল নিজের পছন্দের বিষয়গুলো শেখার ব্যাপারেই শুধুমাত্র আইনস্টাইনের আগ্রহ। এই জ্ঞান পিপাসার কারণেই কৈশোর উত্তীর্ণ হবার আগেই অ্যাডভান্সড ম্যাথমেটিক্স এবং গণিতের ওপর অনেক কিছু শিখে ফেলেন তিনি। তার পরবর্তী ঘটনা শুধুই সাফল্যের। এক সময়কার অত্যন্ত লাজুক ছেলে আইনস্টাইন ১৯০০ সালে ফিজিক্সে গ্র্যাজুয়েশন করেন সুইস ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুল থেকে। ১৯০৫ সালে থিওরি অব রিলেটিভিটির ওপর তার পেপার প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের শাখায় গবেষণার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। এক কথায় বলা যায়, এক বিশেষত্বহীন পরিবেশে জন্ম নিয়েও সম্পূর্ণ নিজ চেষ্টায় ও মেধার বলে আলবার্ট আইনস্টাইন এখন মানব ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

'বাবা-মা'রা সন্তানের ভালো রেজাল্টের পেছনে ছুটছেন। সন্তানটির যদি ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক থাকে তাহলে বাবা-মা মনে করেন সে সময় নষ্ট করছে। আসলে এ ধরনের প্রতিভা লালন করা উচিত। এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো উচিত।'

প্রতিটি দেশে শিশুদের প্রতিভা বিকাশের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে দেখা যায়। এসব প্রতিষ্ঠানে শিশুরা তাদের আগ্রহের বিষয়গুলো প্রশিক্ষণ কিংবা চর্চা করতে পারে। আমাদের দেশে এসব উদ্যোগের অভাব রয়েছে। সরকারিভাবে যদি দেখা যায়, তাহলে টিভির 'নতুন কুঁড়ি' অনুষ্ঠানের কথা বলা যেতে পারে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে শিশুরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে দেখা যায় এ প্রতিযোগিতার মেধাবী শিশুরা দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। বেসরকারি ক্ষেত্রে কয়েকটি এনজিও শিশুদের নিয়ে কাজ করলে তারা শিশুদের ডেভেলপমেন্টের দিকে নজর দেয় না। তবে সুখবর হচ্ছে মাল্টিন্যাশনাল কয়েকটি কোম্পানি শিশুদের বিকাশের ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। উল্লেখ করার মতো নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০-এর উদ্যোগে 'গল্প লেখো গল্প জেতো' প্রতিযোগিতা। নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায়, সহযোগিতায় ২০০০ আয়োজন করে এ প্রতিযোগিতার। গত বছর প্রায় দুই হাজার শিশু অংশগ্রহণ করে এ প্রতিযোগিতায়। নির্বাচিত ১০টি গল্প ছাপা হয় ২০০০-এর ঈদ সংখ্যায়। শিশুদের এই বিশাল অংশগ্রহণ ও তাদের লেখা নিয়ে বরেণ্য সাহিত্যিকরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কথাসাহিত্যিক শওকত আলী বলেছিলেন, 'বাচ্চাদের এই লেখাগুলো আমাকে আশাবাদী করে তুলেছে। এখন আমার মনে হচ্ছে বাংলাদেশকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই।' এ বছরও নিডোর সহায়তায় ২০০০ আয়োজন করেছে এ প্রতিযোগিতার।

আরেকটি প্রতিযোগিতা হলো হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০ কুইজ প্রতিযোগিতা। 'জিনিয়াস বাংলাদেশ ২০০২' নামে হরলিক্সের পৃষ্ঠপোষকতায় সাপ্তাহিক ২০০০ আয়োজন করেছে এ প্রতিযোগিতার। শুধু শিশুদের জন্য নয়, মা'দের সচেতন করার জন্য হরলিক্সের উদ্যোগে সাপ্তাহিক ২০০০ আয়োজন করেছে 'স্মার্ট মা ২০০২' প্রতিযোগিতার। হরলিক্স সাপ্তাহিক ২০০০ কুইজ প্রতিযোগিতায় অন্যতম সমন্বয়কারী গ্রে বিজ্ঞাপনী সংস্থার একাউন্ট গ্রুপ হেড এজেডএম সাইফুদ্দিন বলেন, 'আমরা এ ধরনের অনুষ্ঠান করতে পেরে খুবই আনন্দিত। শুধু পন্য বিক্রির জন্য নয় সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে আমরা কোম্পানিগুলোকে বলি এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে। এতে করে শিশুদের বুদ্ধি বিকাশ ঘটে।' নেস্‌লে-নিডো, হরলিক্সের এ ধরনের কমিটমেন্ট অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

সমগ্র দেশের বিচারে এ ধরনের প্রতিযোগিতার চাহিদা আরো বেশি। এটা নিশ্চিত দেশের আনাচে-কানাচে অনেক প্রতিভাবান শিশু রয়েছে। এদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব সরকারের, আমাদের, বাবা-মার। ড. দিলরুবা আফরোজ এ ধরনের প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে বলেন, 'এ ধরনের প্রতিযোগিতা শিশুদের মেধা বিকাশে খুবই সহায়ক। শিশুকে আরো সজাগ করে তোলে। নিজেকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার না পেলেও শিশুটি যে জায়গায় ছিলো তার থেকে সে অনেক এগিয়ে যায়।'

গবেষণাটি চালান। এরা সবাই ছিলেন সুপারস্টার। এই সুপারস্টারদের মধ্যে ছিলেন অলিম্পিক সাতারু, টেনিস খেলোয়াড়, পিয়ানোবাদক, স্থপতি, ভাস্কর্য শিল্পী, গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র তারকারা পর্যন্ত। যারা সবাই ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবচাইতে সফল এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল।

ব্লুম-এর এই গবেষণা থেকে একটি আশ্চর্যজনক তথ্য বেরিয়ে আসে। তথ্যটি হচ্ছে শুধু প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা নয়, তাদের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়াই হলো তাদের সাফল্যের মূল সূত্র। অর্থাৎ, সফল হবার প্রশ্ন যেখানে উঠেছে, সেখানেই প্রতিভার পাশাপাশি সঠিক অনুকূল পরিবেশে বড় হয়ে ওঠার ব্যাপারটিও গুরুত্ব পেয়েছে সমানভাবে। এ সমস্ত সুপারস্টারদের প্রতিভার ভিন্নতা অবশ্যই রয়েছে, তবে তাদের ছেলেবেলার অভিজ্ঞতাগুলো সংগ্রহ করে দেখা গেছে, সেগুলোতে রয়েছে দারুণ মিল। প্রতিটি প্রতিভার বিকাশের পেছনে রয়েছে 'একটি সাধারণ মূল সূত্র'।

ব্লুম মনে করেন, আমাদের আশপাশের প্রতিটি শিশুর সম্ভাব্য মেধা আমাদের স্বাভাবিক ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। শিশুদের মেধার মান শুধু কিছু আইকিউ বা এ জাতীয় প্রচলিত বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। তার মতে, অনুকূল পরিবেশ আর সঠিক সুযোগ দিলে যে কোনো শিশুই যে কোনো বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। এই সঠিক সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে আরো সূক্ষ্ম ধারণা পাবার জন্য ব্লুম ও তার গবেষণা সহকর্মীরা তাদের গবেষণার বিষয় হিসেবে এমন সব তারকাদের বেছে নিয়েছেন, যারা নিজ নিজ পেশায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে সফল।490 ব্লুমের নেতৃত্বে প্রকাশিত এই গবেষক দলটির একটি বই 'Developing Talent in young People'-এর তথ্য অনুযায়ী তাদের নির্বাচিত তারকাদের গড় বয়স ছিলো ৩৫ বছর। অর্থাৎ জীবনের এমন একটি পর্যায়ে তারা অবস্থান করছিলেন যখন তাদের ছেলেবেলার স্মৃতি বেশ স্বচ্ছ, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বাবা-মা এবং শিক্ষকরা প্রায় সবাই জীবিত।

নির্বাচিত এসব তারকাদের সাক্ষাৎকারগুলো নিয়ে যখন তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলো, তখন পাওয়া গেল আগে দুটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য। প্রথমত বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সেই মিল– সবার গড়ে ওঠাটাই ছিলো ভীষণভাবে একরকম; এই প্রক্রিয়ায়

সবার জীবনেই পাওয়া গিয়েছে সাধারণ ধারার উপস্থিতি। দ্বিতীয় ব্যাপারটা আরো আকর্ষণীয়। তা হলো, সুপারস্টার বা সফল হবার পথে তাদের 590 পরিবারের আশ্চর্য প্রভাব। আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, এদের কারো মা-বাবাই আনুষ্ঠানিক কোনো মাস্টার ব্রেন অনুসরণ করেননি। ব্লুম বলেন, 'আপনি যদি একজন গ্রেট টেলেন্ট তৈরি করার জন্য রীতিমতো পরিকল্পনা হাতে নেন, সেক্ষেত্রে আপনি আপনার সন্তানকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপের মধ্যে ঠেলে দিতে পারেন। যা আপনার পরিকল্পনাকে কখনোই সফল করবে না।' কাজেই বিশাল কোনো পরিকল্পনার মধ্যে না গিয়ে এসব স্টারদের ছেলেবেলায় তাদের অভিভাবকরা যারা করেছিলেন তা হলো– সবসময় সেই সিদ্ধান্তটাই নিয়েছিলেন যা তাদের কাছে মনে হয়েছে ঠিক সেই সময়ে সন্তানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। দিয়ে ব্লুম বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। বিখ্যাত এক টেনিস প্লেয়ারের মা তার স্মৃতি থেকে বলেন, 'তাদের মেয়ে যখন কোলের শিশু, তখন তিনি ও তার স্বামী টেনিস কোর্টে যেতেন টেনিস খেলতে এবং এই সময়টায় মেয়ের বেবি বেডটা রাখতাম কোর্টের পাশেই। 'আমার মেয়ের স্মৃতিতে প্রথম যে শব্দটা সে মনে করতে পারে, খুব সম্ভবত তা টেনিস বলেরই হবে।' আরো একজন তারকা মাতা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন তাদের শিশুপুত্রকে নিয়ে আর্ট গ্যালারি ও শিল্প প্রদর্শনীতে ঘুরে বেড়াবার কথা। কাকতালীয় হলেও এই দম্পতির ছেলেটিই পরবর্তীতে ভাস্কর্য শিল্পী হিসেবে সুখ্যাতি করেছেন।

শতকরা প্রায় পঁচানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে, কোনো একটি বিষয়ে শিশুর আগ্রহের জন্ম ও তা বেড়ে ওঠার শুরুটা হয় এভাবেই। শিশুটি সেই কাজগুলোই করতে পছন্দ করে যা তার মা-বাবার পছন্দের। ব্লুম বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন 800 এভাবে। 'একটি পরিবারে যদি সঙ্গীতের চর্চা অথবা সঙ্গীত প্রীতি থাকে তাহলে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে সেই পরিবারের কোনো সন্তান একজন গুণী সংগীত শিল্পী হবেন। কিন্তু এটা ধরে নেয়া যায় যে পরিবারের সঙ্গীতের অস্তিত্ব নেই, সেই পরিবার থেকে কোনো সঙ্গীত শিল্পী বেরিয়ে আসবে না।'

প্রাথমিকভাবে ভিন্ন একটি ধারনা মাথায় নিয়ে ব্লুম শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শুরু করেন। তার ধারণা ছিলো, পরিণত বয়সে যারা সুপারস্টার তারা একেবারে অল্প বয়সেই তাদের মেধার স্ফুরণের কারণে সবার নজর কেড়েছিলেন। গবেষণা শুরু করার পর তিনি দেখলেন তার ধানাটি ভুল। যখন সুপারস্টারদের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন, সেই বাস্তবতা বললো ভিন্ন একটি গল্প। ব্লুম আবিষ্কার করলেন, নিতান্ত শিশু অবস্থায় নয় বরং বেশ কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রমের পরই তারা 'মেধাবী' হিসেবে সবার চোখে পড়েন। অর্থাৎ মেধা তাদের মধ্যে ছিলো সুপ্ত অবস্থায় পরিশ্রম ও অনুশীলনের মাধ্যমে তারা মেধার বিকাশ করেছেন। অনেক তুখোড় বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের ছেলেবেলা হাতড়ে লক্ষ্য করা যায়, পড়াশোনা ও বোঝার ব্যাপারে অনেক সাধারণ শিশুর মতোই প্রাথমিক অবস্থায় তাদের সমস্যা ছিলো এবং অনেকের বেলায়ই শেখার বিষয়টাকে আত্মস্থ করতে বেশ সময় লাগতো। কেউ কেউ বুঝতে শিখেছেনও অনেক দেরিতে। এই উদাহরণগুলো নিশ্চয়ই আপনাকে বুঝতে সাহায্য করছে যে তুখোড় সব বিজ্ঞানীদের শৈশবগুলো ছিলো নিতান্তই স্বাভাবিক এবং আপনার সন্তানটির মতোই। অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক চর্চাই তাদের মেধার বিকাশ সাধন করেছে। আর এসব প্রতিভারাই নিত্যদিন আমাদের চারপাশের সবকিছুকে করছে সহজলভ্য। এমনকি পেশাদার সাঁতারুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা অনেক কম বয়সেই পেশাদার সার্কিটে যোগ দেয়। হয়তো ভাবতে

বিল গেটস

স্কুল পালানো, ক্লাস ফাঁকি দেয়া এমনকি একবার স্কুল থেকে ড্রপ আউট হওয়া দুরন্ত সেই কিশোর বিল আজকে পৃথিবীর শীর্ষ ধনী। তারচে' বড় কথা, পৃথিবীর ৯৫ ভাগ কম্পিউটারে ব্যবহৃত 'এমএস-ডস' অপারেটিং সিস্টেমের জন্মদাতা। স্মরণ করুন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের সেই বিখ্যাত উক্তি– 'প্রতিভা হচ্ছে এক ভাগ প্রেরণা এবং বাকি নিরানব্বই ভাগ পরিশ্রম'। কেবল প্রতিভার ঝলকে বিল গেটস এতো দূর এসেছেন? বিল নিজেই বলেছেন, এসব তার পরিশ্রমের ফসল।

কিছুদিন আগে বিল গেটস কসমেটিক সার্জারি করেছেন। উদ্দেশ্য, চেহারাটা খানিকটা ধারালো করা। ছোটবেলা থেকেই বিলের চেহারা শিশুসুলভ, ভোলাভালা। কিন্তু মস্তিষ্কটা শৈশব থেকেই পরিষ্কার। প্রাথমিক স্কুলেই অঙ্ক আর বিজ্ঞানে তার দখলের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও বোনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব বিষয়ে 'A' গ্রেড পাওয়া তার সম্ভব হয়নি। অষ্টম গ্রেড পর্যন্ত তার জিপিএ'র গড় ছিলো ২.২ থেকে ৪। গেটস যেন সবগুলো বিষয়ে 'A' পায় সেজন্য তার বাবা-মা পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রতিটি 'A' গ্রেডের জন্য ২৫ সেন্ট। রেজাল্টের জন্য ক্লাসের ছেলেদের হাসির পাত্র ছিলেন গেটস।

পরবর্তী সময় বদলে যাওয়ার। ১৩ বছর বয়সে গেটস লেকসাইড প্রিপারেটরি স্কুলে। ১৯৬৮'র বসন্তে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটারের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। গেটস যেন খুঁজে পান আপন ভুবন। দিন-রাত পড়ে থাকতেন কম্পিউটার ল্যাবে। হোমওয়ার্কে গাফিলতি আর ক্লাস কামাই হয়ে দাঁড়ায় নিত্য নৈমিত্তিক। কিন্তু কম্পিউটারের পেছনে সময় খরচ বৃথা যায়নি। গেটস এবং তার অন্য কিছু বন্ধু দারুণ দক্ষতা লাভ করেন প্রোগ্রামিংয়ে। শুনতে অবাক লাগলেও গেটস পরিণত হন একজন হ্যাকারে!

বিল গেটস, পল অ্যালেন এবং আরো দু'জন হ্যাকার মিলে '৬৮ সালে গঠন করে 'লেকসাইড প্রোগ্রামারস গ্রুপ'। এই গ্রুপের প্রথম শিকার হয় স্কুলের কম্পিউটার সিস্টেম। লেকসাইড স্কুলে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের সুবিধা দিচ্ছিলো যে সংস্থা, সেই 'কম্পিউটার সেন্টার কো-অপারেশন' বা 'সিসিসি' চমৎকৃত হয় তরুণ হ্যাকারদের দক্ষতায়। তাদের কাজে লাগানো হয় সিস্টেমের ত্রুটি খুঁজে বের করতে। বিনিময়ে তারা যত খুশি কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করে। কম্পিউটারের ত্রুটি খুঁজে বের করার চাকরি পেলেও গেটস ও তার সঙ্গীরা কম্পিউটার সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত পড়ার সুযোগ পান। মূলত এ সময়ই গেটস ও অন্য তরুণ হ্যাকাররা তাদের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পান। মাইক্রোসফট যার ফসল।

বিল গেটসের এই সাফল্যের কারণ শুধু যে তার প্রতিভা তা নয়। শৈশব থেকেই দারুণ পরিশ্রমী গেটস পাশে পেয়েছেন তার বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিভা বিকাশক পরিবেশ। লেকসাইডে পড়ার সময় কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ ছিলো বিরল। কিন্তু যেটুকু সময় গেটস পেতেন, কম্পিউটারে মজে থাকতেন। '৭৩-এ হার্ভার্ডে পড়তে এসে তার সেই অধ্যবসায়ে ঘাটতি পড়েনি। বরং তিনি হার্ভার্ডের সবচে' কঠিন ম্যাথ কোর্স গ্রহণের পরেও কম্পিউটার ছাড়েননি। এমনও দিন গেছে, তিনি কম্পিউটার ল্যাবের টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছেন। পরবর্তীতে মাইক্রোসফটের প্রথম দিনগুলোতে তিনি একদিনও অফিস কামাই দেননি। বহু বছর ধরে তিনি সারা দিনে কেবল সর্বোচ্চ ছয় ঘন্টা ঘুমিয়েছেন। এমনকি বিয়েও করেছেন দেরিতে, ত্রিশের শেষার্ধে। কাজ পাগল গেটস ক'দিন আগে প্রধান নির্বাহীর পদ ছেড়ে মাইক্রোসফটের প্রোগ্রামার হিসেবে কাজে নেমেছেন। 'প্রতিভার' নিরানব্বই ভাগ 'পরিশ্রম'– গেইসই তার সেরা উদাহরণ।

পারেন তারা নিশ্চয় জন্ম থেকেই প্রতিভাবান। আসলে তাদের এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে ছেলেবেলা থেকেই শারীরিক সুস্থতা ও শক্তিশালী হবার কঠিন সাধনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এসব সাঁতারুর বাবা-মা'রা তাদের সন্তানের প্রতিভায় রূপ দেবার বাসনায় শিশুটির মুখে কথা ফোটার আগেই তাকে শেখান কিভাবে জলে ভেসে থাকা যায়। আর শুরু থেকেই নিরবচ্ছিন্ন সাধনা বিকাশ করে তাদের প্রতিভা। আর প্রায় প্রতিটি পেশাদার সাঁতারুরই পরবর্তী গল্পগুলো ঠিক একইরকম সেই রূপকথার রাজপুত্রের গল্পের মতো।

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার পাশাপাশি এসব ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ছিলো যে ব্যাপারটি তা হলো, তাদের সবার অভিভাবকই ছিলেন ভীষণরকম সতর্ক ও যত্নবান। সহজ ভাষায়, তাদের সন্তানের তুচ্ছতম কাজটিকেও তারা অবহেলা করেননি বরং সেটিকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। সামান্য ছোট্ট কোনো কাজে অসামান্য উৎসাহ হতে পারে শিশুর মেধা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ। হয়তো এ থেকেই শুরু হতে পারে আশ্চর্য কিছুর মেধার বিকাশ। অবশ্য কোনো বিষয়ের প্রতি বাবা-মার আগ্রহ বা অনাগ্রহ খুব স্বাভাকিভাবেই সন্তানের পছন্দকে প্রভাবিত করে। খ্যাতনামা এক চিত্রশিল্পীর ছেলেবেলায় আঁকা সবকটি ছবি তার মা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি, একজন ক্রিকেটপ্রেমী বাবা তার ছেলের প্রত্যেকটি ভালো শটের জন্য আলাদাভাবে প্রশংসা করতেন। হয়তো বা একজন গণিতবিদ বাবার জন্য তার খেলা পাগল ছেলেটির আচার-আচরণ বাবার চিন্তার খোরাক হয়ে যেতো। অর্থাৎ অভিভাবক হিসেবে আপনিই পারেন আপনার সন্তানকে যে কোনো পছন্দের বিষয়ে তাকে উৎসাহ দিতে। তবে অবশ্যই সেটি আপনার সন্তানের পছন্দের হতে হবে। তবে এ কথাটিও বাস্তব যে, আপনার প্রতিটি কাজ ও পছন্দ বা অপছন্দ আপনার সন্তানকে আকৃষ্ট করে এবং তার মানসিকতার প্রভাব ফেলে। এভাবে তারও পছন্দ-অপছন্দের সৃষ্টি এবং অন্যান্য মানসিকতা বিকাশ পায়।

৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে তারকাখ্যাতি পাওয়া এক সাঁতারুর বাবা ছিলেন একজন কাঠের কারুশিল্পী। তো কাঠের কাজ করার সময় যদি সামান্যও ভুল হলে তিনি সম্পূর্ণ জিনিসটি বাতিল করে প্রভাব ফেলে আবার গোড়া থেকে শুরু। তার এই অধ্যবসায়ের উদাহরণ গভীরভাবে প্রভাব ফেলে তার ছেলের মনে। ব্যাপারটি তিনি ভোলেননি। প্রায় দশ বছর পর, অগুনতি বিজয়ের ট্রফি আর অলিম্পিক পদকে সুসজ্জিত স্বীয় কক্ষে বসে সফল সেই সাঁতারু বলেন, 'আমার বাবা আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, তুমি যদি কোনো কিছু করতে চাও, তবে সেক্ষেত্রে তোমাকে হতে হবে শতভাগ নির্ভুল।'

'আমাদের আশপাশের প্রতিটি শিশুর সম্ভাব্য মেধা আমাদের স্বাভাবিক ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। অনুকূল পরিবেশ আর সঠিক সুযোগ দিলে যে কোনো শিশুই যে কোনো বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে'

বেনজামিন ব্লুম

গবেষক, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়

এভাবে নির্বাচিত প্রায় সব স্টারই তাদের ছেলেবেলার এমন কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলেন যা তাদের সফল হবার পথে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সবাই স্বীকার করেছেন পরিশ্রম ছাড়া তারা তাদের মেধার বিকাশ করতে পারতেন না। যদিও তারা তুলনামূলকভাবে কম বয়সেই সফল হয়েছেন, তার পেছনে ছিলো প্রায় দশ থেকে বারো বছরের কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়। স্টার হবার পথে অনুশীলন বা সাধনার এই সময়টিকে ব্লুম ভাগ করেছেন তিনটি পর্যায়ে-

প্রথম পর্যায় : প্রাথমিকভাবে এই পর্যায়ে রয়েছে কোনো বিষয়ের প্রতি শিশুর আকর্ষণ সৃষ্টি এবং অতঃপর এই আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ এবং সেই বিষয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসার সৃষ্টি। **দ্বিতীয় পর্যায় :** আত্মস্থকরণ : প্রথম পর্যায় অতিক্রান্ত হবার পরের স্তরটি হলো দক্ষতা অর্জন বা আত্মস্থকরণ। নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণ দক্ষ হয়ে ওঠার ব্যাপারটিকে তারকারা সবাই ভীষণ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। **তৃতীয় পর্যায় :** সর্বশেষ পর্যায়টি হলো, আত্মস্থ বিষয়টিকে নিজের মতো করে প্রকাশ করা, অর্থাৎ আত্মায়ন করা। ব্লুমের ভাষায়, 'Making it your non'। এই পর্যায় এসেই প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠে স্বাতন্ত্র্য। যাকে নাম দেয়া হয়েছে style নিজস্ব ক্ষেত্রে এই স্বকীয়তাই সুপারস্টারদের খ্যাতির কারণ।

তারকা সন্তানদের পিতামাতা সবসময় সন্তানকে সাহায্য করেছেন তার পছন্দের বিষয়ে সর্বাধিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। সন্তানের 'শুধুমাত্র ভালোলাগা' পর্যায়ের উপযুক্ত সময়ে তারা তাকে নিয়ে গেছেন একজন প্রশিক্ষকের কাছে। প্রথম প্রশিক্ষক হিসেবে তারা এমন একজনের শরণাপন্ন হয়েছেন, যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুদক্ষ, তবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে খুব কড়া বা অতিরিক্ত পেশাদার মনের নন। বরং এমন একজনকে তারা দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যিনি শিশুর ন্যূনতম দক্ষতা প্রকাশেও তাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেন। তিনি শিশুর কাছে শুধু একজন শিক্ষকমাত্র নন। তারচেয়ে অনেক বেশি একজন বন্ধু এবং যিনি অল্পতেই প্রশংসা করেন। করতে জানেন। সচেতন বাবা-মা এই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই নির্বাচন করবেন শিশুর প্রথম শিক্ষক।

কিছুদিন পর শিশুটি যখন তার নির্বাচিত বিষয়ে কিছুটা ধারণা অর্জন করবে, তখন তাকে নিয়ে যেতে হবে একজন নতুন প্রশিক্ষকের কাছে। এই প্রশিক্ষক হবেন তুলনামূলকভাবে চাহিদা সম্পন্ন ও নিখুত। পূর্ববর্তী শিক্ষকের তুলনায় তিনি ছেলেটি বা মেয়েটির কাছ থেকে। অনেক বেশি আদায় করে নিবেন। গানের শিক্ষকটি তার ছাত্র-ছাত্রীকে একটিই সুর বা তালের অনুশীলন করিয়ে যাবেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত না সেটি পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধ হচ্ছে। এমন একজন 'কোচ'-এর তত্ত্বাবধানে থাকলে নির্দিষ্ট একটি খেলাতেও যে কেউ দক্ষ খেলুড়ে হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এই পর্যায়টাকেই মেধার বিকাশের মূল পর্যায় বলা যায়। সর্বশেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীর জন্য এমন একজন শিক্ষক খুঁজে বের করতে হবে যিনি সেই বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের একজন। যিনি সকল প্রতিভাবান ছাত্রেরই শিক্ষক, এবং একজন তুখোড় ছাত্রের জন্য একজন তুখোড়, মেধাবী প্রশিক্ষকও।

এ কথা সত্যি সফল মানুষ তৈরি করা কোনো বাবা-মার জন্যই ছেলেখেলা নয়। নির্দিষ্ট বিষয়ে সন্তানের দক্ষতা অর্জনের পুরো সময়টাতে অভিভাবকদের থাকতে হবে পরিপূর্ণ সতর্ক। প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা, সময় এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণাদি সময়মতো সরবরাহ করার ক্ষেত্রে তাদের মনোযোগ দিতে হবে। নিজেদের কর্মব্যস্ত রুটিনের ফাঁকে সন্তানকে দেবার জন্য যথেষ্ট সময় বের করতে

নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০
'গল্প লেখো... গল্প জেতো'
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে
হলে ৪৬ ও ৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ডিয়াগো আরমান্ডো ম্যারাডোনা

ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তি। সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে যার নাম উচ্চারিত হয় পেলের সঙ্গেই। সম্পূর্ণ একক কৃতিত্বে ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন নিজ দেশ আর্জেন্টিনাকে। দলকে তুলেছিলেন '৯০-এর ফাইনালেও। তিনি ছিলেন ফুটবলের জাদুকর। কিন্তু এই যে বিস্ময়কর প্রতিভা তা কিন্তু রাতারাতি গড়ে ওঠেনি। দুঃখ-দারিদ্র্য, হতাশা, বঞ্চনার সঙ্গে লড়াই করে ম্যারাডোনা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাফল্যের জন্য তাকে পোড়াতে হয়েছে অনেক কাঠ-খড়। শ্রম, সাধনা ও একনিষ্ঠ ছিলো তার কৃতিত্বের উৎস।

ম্যারাডোনার জন্ম ১৯৬০ সালের ৩০ অক্টোবর। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সের শহরতলীর বস্তি লানুস-এ। চরম দারিদ্র্যের জন্য এই এলাকাকে বলা হতো 'দুরাবস্থার শহর'। ম্যারাডোনার পূর্বপুরুষের বাস ছিলো ইটালিতে। উদ্বাস্তু হয়ে এই পরিবারটি পরে বসবাস শুরু করে আর্জেন্টিনায়। ম্যারাডোনার বাবা ছিলেন কারখানার সাধারণ শ্রমিক। বেতন পেতেন খুবই সামান্য। সংসারের অভাব তাতে ঘুচতো না। তার ছেলেমেয়ে ছিলো আটজন। ম্যারাডোনা তাদের মধ্যে পাঁচ নম্বর। বাবার স্বপ্ন ছিলো, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। কিন্তু যাদের দু'বেলা ভাত জোটে না, লেখাপড়া তো তাদের কাছে বিলাসিতা।

লেখাপড়া ম্যারাডোনার শেখা হয়নি। তবে ফুটবলের প্রতি নেশাটা ছিলো সেই শৈশব থেকেই। রাস্তার ধারের কাগজ দলা পাকিয়ে পুরনো মোজায় ভরে গোল করে তৈরি করা ফুটবলেই তা হাতেখড়ি। কারণ চামড়ার ফুটবল কিনে দেবার সামর্থ্য তার বাবার ছিলো না। ছেলের আগ্রহের কারণে কিছুদিন পর বাবা তাকে কিনে দিলেন রাবারের বল। বস্তির একমাত্র বলটির মালিক ডিয়াগো। সে সূত্রে বস্তির সমস্ত কিশোরদের নেতা। তাদের সঙ্গে নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে সারা দিন চলতো ডিয়াগোর ফুটবল চর্চা।

এই বস্তিতে ফুটবল খেলার সময়ই এক ভদ্রলোকের নজর কাড়লেন ম্যারাডোনা। ভদ্রলোক আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ক্লাব বোকা জুনিয়র্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনিই ম্যারাডোনার বাবার সঙ্গে কথা বললেন। প্রস্তাব দিলেন ম্যারাডোনাকে বোকা জুনিয়র্স ক্লাবে নিয়ে যাবার। প্রস্তাব শুনে ম্যারাডোনা তো রীতিমতো উল্লসিত। যোগ দিলেন ক্লাবে। তার ড্রিবলিং, বল কন্ট্রোল পাওয়ার, শ্যুটিং স্কিল দেখে ক্লাব কর্মকর্তা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই আর্জেন্টিনার প্রথম ডিভিশন ফুটবল খেলার সুযোগ পান। প্রথম খেলায় হ্যাটট্রিক করে চমকে দেন সবাইকে। ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নিজের নাম না দেখে ম্যারাডোনা খেলাই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। তা তিনি করেননি, সেটা সমগ্র ফুটবলপ্রেমীদের সৌভাগ্য। ১৯৭৯ সালে যুব বিশ্বকাপে অসাধারণ খেলে শিরোপা জেতালেন আর্জেন্টিনাকে। '৮২-এর বিশ্বকাপে ব্যর্থ হলেও '৮৬ সালে তারই একক কৃতিত্বে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। '৯০তেও দলকে ফাইনালে তোলেন। ক্লাব ফুটবলে তার সাফল্য ঈর্ষণীয়। ইটালির মাঝারিমানের দল নেপোলিকে তিনি পরিণত করেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবল ক্লাবে। ড্রাগ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে তার কেরিয়ারের শেষটা মধুর না হলেও ম্যারাডোনা ফুটবলমোদীদের মনে চিরকালই থাকবেন। একেবারেই শূন্য থেকে সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবল খেলোয়াড়ে পরিণত হয়ে ম্যারাডোনা প্রমাণ করেছেন ইচ্ছা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা থাকলে যে কোনো কাজেই চূড়ান্ত সাফল্য অনিবার্য।

হবে। ধরে রাখতে হবে মানসিক শক্তি ও ধৈর্য। হয়তো, সন্তানের জন্য এই পরিমাণ অর্থ ও সময় ব্যয় করা কোনো কোনো বাবা-মার পক্ষে খুব সহজ নয় কিন্তু বাবা-মার এই সময় দেয়াটাই হতে পারে তার সন্তানের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট টনিক যা তাকে মানসিকভাবে দৃঢ় করবে। ব্লুমের বর্ণনায় আছে, একজন উঠতি সঙ্গীত শিল্পীর বাবা তার শিশু সন্তানের জন্য একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো কেনাকেই বেশি গুরুত্ব দেন এমন একটা সময়ে যখন হয়তো তার পরিবারের জন্য একটি মোটরগাড়ির খুব প্রয়োজন ছিল। টেনিসপ্রেমী এক পরিবার তাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো কাটাতো ছেলের সঙ্গে টেনিস খেলে এবং খেলা দেখে। ছুটির অলস আমেজ ভোগ করার তুলনায় সন্তানের জুনিয়র লেভেলের ম্যাচগুলো উপভোগ করাকে তারা বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অনেক মা-বাবার কাছেই এটি হয়তো অনেক ঝামেলার ব্যাপার, কিন্তু সেই মাকে এ ধরনের একটি প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, তিনি ও তার স্বামী তাদের ছেলেটির মতোই খেলাগুলোই উপভোগ করতেন। তার বক্তব্য ছিল, 'আমরা বিশ্বাস করি, অভিভাবক হিসেবে আমাদের এই ত্যাগের মাধ্যমে পরিবার হিসেবে আমরা হয়েছি অনেক, অনেক দৃঢ়'।

যেকোনো সাধারণ শিশুর মতোই আপনার সন্তানটিকে হয়তো বারবার তার অনুশীলনের কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। আপনার সন্তান হয়তো তার উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারে তার পছন্দের বিষয় থেকে। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এক্ষেত্রে অভিভাবকের হিসাবে আপনার উচিত পুনরুদ্যমে সন্তানকে উৎসাহিত করা। তাকে বিশাল কোনো সারপ্রাইজ দেয়াটাও তার জন্য বিশাল উৎসাহের কারণ হতে পারে। এক সাঁতারুর বাবা তার ছেলের শৈশব স্মৃতিচারণ করবার সময় বলেন, আমার ছেলে একটি নির্দিষ্ট বয়স গ্রুপ অতিক্রম করে উপরের বয়স গ্রুপে প্রতিযোগিতা শুরু করলে প্রথমদিকে শুধুই হারতে থাকে। ক্রমাগত হারতে থাকলে তান মনোবল ভেঙে যায় এবং সে আমাকে বলে সাঁতার ছেড়ে দেবে।' সচেতন বাবা খুব সহজেই ছেলের নিরুৎসাহের কারণ বুঝে ফেলেন এবং বেশ মজার এক প্রস্তাব দেন। তিনি সন্তানকে বোঝান তার সাঁতার ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে তবে তাকে অবশ্যই প্রতিযোগিতায় জিতে বিজয়ী হিসেবে সাঁতার ছাড়তে হবে। কিছুদিনের মাথায় ক্ষুদে সাঁতারু আবার জিততে শুরু করে এবং এবার আর কখনোই সে সাঁতার ছাড়ার কথা চিন্তাও করেনি। আপনার এরকম উৎসাহ দান আপনার সন্তানকে বিজয়ী হতে সাহায্য করবে। আপনার সন্তানের একটি বিজয় আপনাকে কতোটুকু আনন্দ দেয় তা আপনার সন্তানকে জানতে হবে। অনুশীলন ও সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে তার পরাজয়েও আপনাকে তার পাশে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সন্তানের সাথে তার বিভিন্ন দুর্বলতা নিয়ে খোলামেলা আলোচনাও তাকে সাহায্য করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে সবসময় মনে করিয়ে দিতে হবে যে, তার বিজয়ই শুধু নয় বরঞ্চ তা ভালো বা খারাপ পারফরমেন্সটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, আপনার সন্তানকে ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনার বা প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখুন যতোক্ষণ না তার পছন্দের বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও গুরুত্ব সে অনুধাবন করতে পারে।

সন্তানের বয়স কিছুটা বাড়লেই তাকে

নিজেকেই সব দায়িত্ব বুঝে নিতে দিন। তখন ছেলেটি বা মেয়েটি আপনি থেকেই প্রয়োজন মতো মা-বাবা বা প্রশিক্ষকের সাহায্য নিবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে সময় একজন উঠতি শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি অনুশীলন করানো কখনোই শরীর ও মনের জন্য ভালো নয়। তাই তার পছন্দের কাজের অনুশীলনের সঙ্গে সাথে স্কুলের পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজে সময় দেয়া জরুরি। স্টারদের জীবন লক্ষ্য করলে দেখা যায় তারা কিশোর বয়সে সপ্তাহে প্রায় পঁচিশ ঘন্টা প্র্যাকটিস করতো। একজন কিশোরের জন্য এটি নিতান্তই কম সময় কারণ সে আরো অনেক বেশি সময় পার করে টিভি দেখে ও গেমস্ খেলে। আপনার সন্তানের চেয়েও অনেক বেশি প্রতিভাবান শিশু একই বিষয়ে দক্ষ থাকতে পারে কিন্তু একটি রুটিন প্রশিক্ষণ একজন কম প্রতিভাবানকেও সফল করতে পারে। তাই কঠোর সাধনাই মেধার বিকাশের একমাত্র পথ।

ব্লুমের গবেষণায় অংশগ্রহণ করা এসব স্টারদের মা-বাবারা যদিও সকলেই তাদের সন্তানদের এই পথচলাটা বেশ উপভোগ করতেন; কিন্তু সন্তানের স্বপ্নীল ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিশ্চিত থাকতেন না। বরঞ্চ তারা কিন্তু ছোট ছোট লক্ষ্যস্থির করতেন এবং সন্তানের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা চালাতেন। সন্তানের এই পথচলাকে সহজ করার জন্য তাদের অভিভাবকরা সবসময় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতেন। অভিভাবকদের এমন দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং যথেষ্ট সুযোগ প্রদানই তাদের স্বীয় ক্ষেত্রে সফল করেছে বলে তারকারা বিশ্বাস করেন।

ব্লুম বিশ্বাস করেন, প্রতিটি শিশুর মধ্যেই সুপ্ত মেধা আছে এবং বিভিন্ন শিশুর মেধার মাঝে আছে ভিন্নতা। শিশুর এই মেধাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার কাজটাই করতে হবে অভিভাবকের। একজন মানুষের একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের

প্রাথমিক পর্যায়টা হলো তার সুযোগ পাওয়া। আর বাবা-মাকেই সন্তানের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। আর একটি কথা জেনে রাখা দরকার। আপনার সন্তানকে অবশ্যই সর্বোচ্চ পর্যায়ে সফল হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আপনার সন্তানটি হয়তো চূড়ান্ত পেশাদার পর্যায়ে নাও যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তার এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ভালোবাসা তাকে উন্নততর নিশ্চয়তা দেবে। হয়তো সে পেশাদার পর্যায়ে সফল হবে না। কিন্তু একজন অপেশাদার ক্রিকেট প্লেয়ার বা ফুটবলারের একজন ভীষণ ভক্ত দর্শক হিসেবে সে নিজেকে তৈরি করতে পারে। তার এই যেকোনো পছন্দের পেশায় ভালো লাগাটাও তাকে মানসিক সন্তুষ্টি দেবে অনেক বেশি। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন- তাহলে এই অর্থ ব্যয় আর পরিশ্রম সবকিছুই কি বৃথা? না, শিশুটির ছেলেবেলার সেসব পরিশ্রম আর অধ্যবসায় তাকে একটি বিষয় শেখাতে পারে, তা হলেভ নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। এসব চর্চা আর নিখুঁত শিক্ষা তাকে জিততে শেখায়। তার মানসিক দৃঢ়তা যে কোনো সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি হবে। দক্ষতা মানুষকে মানসিকভাবে দৃঢ় হতে সাহায্য করে।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে- 'All you need in life is to master the skills to act like a winners' আপনার সন্তানের মানসিক দৃঢ়তা। সবকিছুকে জয় করবার জন্য তার চেষ্টা তাকে নিশ্চিতভাবে একটি উন্নত ও সফল জীবনের নিশ্চয়তা দেবে। আর একটি সফল সামাজিক অবস্থানই হতে পারে মানব জীবনের দৃঢ়তম অবলম্বন।

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০

কুইজ প্রতিযোগিতা

বিস্তারিত জানতে ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

- আপনি কি একজন স্মার্ট মা?
- আপনার সন্তান কি জিনিয়াস?

জিতে নিন ফ্রিজ, কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট এবং আরো আকর্ষণীয় পুরস্কার